মহাবোধি

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অন্তরাত্মাকে বহির্বিশ্বরূপে এবং বাহ্য বিশ্বকে অন্তরাত্মারূপে দর্শন করাই সর্বসাধনার সিদ্ধি। নিজেকে বাঙ্ময় বলিয়া অনুভব করা এবং বিশ্বকেও বাঙ্ময় বলিয়া চিনিয়া লওয়ার নাম ''অগ্নিচয়ন''। বাক্‌ই অগ্নি। নচিকেতা এই অগ্নিচয়ন বিদ্যা যমের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। নচিকেতার পিতা ঋষি বাজশ্রবা একদা বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে দক্ষিণাস্বরূপ পিতৃদত্ত—গাভীগুলিকে পুত্র নচিকেতার চক্ষে অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হইলে বারংবার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''পিতঃ, আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ কাহাকে দান করিলেন?'' পিতা তাহাকে যমের উদ্দেশ্যে দান করিলে পুত্র ভাবিল, ''বহুর মধ্যে আমি উত্তম, কারণ আমি আত্মদ্রষ্টা পুরুষ, বহুর মধ্যে আমি মধ্যম কারণ আমি প্রাণদ্রষ্টা পুরুষ কিন্তু আমি তো এখনও অধম হইতে সক্ষম হই নাই অর্থাৎ সর্বভূত বিশ্বরূপ স্থূল জগৎকে প্রাণময় আত্মারূপে এখনও দর্শন করিতে পারি নাই, তাই পিতা আজ বুঝি আমাকে যমের বাড়ী পাঠাইলেন।'' এই তিন ভূমিতে আত্মোপলব্ধির জন্য তাহাকে যমের বাড়ীতে আসিয়া তিনদিন উপবাস করিতে হইয়াছিল। এই স্থূল জগৎ বা আমাদের স্থূল শরীরই হইল যমের আলয় বা মর্ত্যভূমি। শরীর অর্থে শীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকা। এখানে আত্মদর্শন না হইলে জীব মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া অমৃত লাভ করিতে পারে না। মৃত্যুও যে জীবের জীবনেরই একটা অজ্ঞাত অংশ, তাহা আবিষ্কার করিতে না পারিলে জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। তাই নচিকেতাকে মৃত্যুঞ্জয় হইতে হইবে। আত্মদান বা আত্মদর্শন করার নাম 'পূজা' এবং সেই পূজার মন্ত্র হইল স্বাহা। 'স্বাহা' অর্থে ''আত্মদান'' করা বুঝায়। নিজেকে বাহ্য বিশ্বরূপে আত্মবিস্তার করিয়া দেখিয়া লইয়া নিজেকে বিশ্ব চেতনার মধ্যে বিলাইয়া দিয়া আত্মদান করিতে হয় এবং পুনরায় বিশ্বরূপ আত্মাকে নিজের মধ্যে পরিগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে আত্মাকে দান এবং প্রতিগ্রহ করাই প্রকৃত ব্রাহ্মণের ধর্ম। ইহারই নাম আত্মকেন্দ্রে ফিরিয়া আসা অর্থাৎ আত্মদর্শন বা দক্ষিণা। যে সর্বভূতে আত্মাকে দেখে ও আত্মাতে সর্বভূতকে দর্শন করে, সে-ই ভগবানের বরণীয় হয়। সে ব্যক্তি ভগবৎ কৃপালাভে ধন্য হইয়া যান।

বরফের ভিতর যেমন জল লুকাইয়া থাকে, জলের মধ্যে যেমন থাকে তরঙ্গ, মেঘে বিদ্যুৎ, বায়ুতে ঝড়, বারুদে অগ্নি, কাঠের ভিতরে কাঠের সমস্ত আসবাবপত্র, তেমনি আত্মার ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে বাক্। প্রদীপ হইতে যেমন সর্বদা আলো ক্ষরিত হয়, সূর্য হইতে যেমন কিরণ বিকিরণ হয় তেমনি আত্মা হইতে নিয়ত বাক্ বা কথা নির্গত হয়। আত্মার শক্তিই বাক্। এই জন্য জগতের আত্মা সূর্য্যকে বলে রবের দেবতা 'রবি'। এই বাক্ বা কথা হইতে অন্তরে জ্ঞান বা বোধ জন্মায় যাহাকে ''চিন্তা'' বা চিন্তন বলা হয়। মনের মধ্যে সর্বদা যে চিন্তার উদয় হয়, উহাকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি কথা বা বর্ণের সমষ্টি পাওয়া যায়। এই বর্ণ বা অক্ষরগুলির ওলট-পালটেই নানান চিন্তা বা বোধের উদয় হয়। জীবের ভূমিতে এই কথা বা চিন্তা একটির পর আর একটির উদয় হয়, সমগ্র কথা বা বোধ একসঙ্গে উদয় হয় না। একটি কথা বা বোধ অন্তরে উদয় হইল এবং পরে উহা লুপ্ত হইয়া যখন অসঙ্গ, অব্যক্ত অক্ষয় ভূমিতে চলিয়া গেল, তখন আবার আর এক কথা মনে উদয় হইল। এইরূপে বোধের মধ্য দিয়া ক্রমধারায় জীব বিশ্ববোধ করে। মনে সর্বদা কত কথা বা চিন্তার উদয় হয়। উহাকে আত্মবোধের সুষুম্নার পথে গুরুপোদিষ্ট মতে চালিত করিলে জীব নিশ্চিত নিশ্চিন্ত হয়। এই উদ্দেশ্যেই সূর্যের অর্ঘ্য দানের বিধান আছে শাস্ত্রে। এই জন্যেই প্রত্যেক সাধকের দীক্ষার প্রয়োজন হয়। মনন বা চিন্তা হইতে যাহা দ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাই হইল ''মন্ত্র'' বা ''বীজমন্ত্র''। একটি বীজের মধ্যে যেমন অনন্ত বৃক্ষ লুকাইয়া থাকে, একটি স্ফুলিঙ্গে যেমন বিশ্বগ্রাসী অগ্নি নিহিত থাকে, তেমনি একটি একাক্ষর বীজমন্ত্রের মধ্যেও অনন্তশক্তি নিহিত থাকে। এই বিশ্ববোধটি জ্ঞানের মধ্যে চেতনায় থাকে এবং সেই জ্ঞানই আমরা কথায় প্রকাশ করিয়া থাকি। অতএব এই কথায় বা মন্ত্রেই বিশ্ব আছে। মন্ত্র বলা কিন্তু কথা বলা নয়, একটা চেতনার বা কথার মধ্যে প্রাণময় আত্মাকে অবলোকন করা। কথার যে শক্তিতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হয়, তাহারই নাম 'প্রাণ' এবং সেই শক্তির পুনঃ কথায় প্রত্যাবর্তনের কালের পরিমাণই হইল 'আয়ু' এবং শ্বাস-বায়ু সেই প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া চলে। প্রাণের এই বহিঃপ্রকাশ শ্বাস-প্রশ্বাস রূপের নামই হইল ''কাল''। ''কাল'' জীবের কর্মের নিয়ন্তা। এই কালের অধীশ্বর হইলেন ''মহাকাল''। তাই তিনি কালজয়ী পুরুষ। তাই সাধক ''মন্ত্রযোগ'' অবলম্বন কর। মন্ত্র ও যোগ ভিন্ন কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি সব যোগই ব্যর্থ। ঋষিগণ বাক্যর প্রচণ্ড শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া মন্ত্রশক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করিয়াছেন বিভিন্ন শাস্ত্র ও দর্শনের মাধ্যমে। নিজের ভিতর দিয়াই নিজেকে দর্শন করার পথই সনাতন পথ, বেদের পথ, সুষুম্নার পথ ও অমৃতের পথ। প্রাণের এই পথেই সাধককে যাইতে হইবে হৃদয় কেন্দ্রে নিত্যে শাশ্বতে। তাই ওঙ্কার মন্ত্র অবলম্বন করিয়া, ওঙ্কার দেহ লইয়া, ওঙ্কার রূপ তরণী অবলম্বন করিয়া, দুর্গম ভব পারাবারকে অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে অনন্ত চেতনার কেন্দ্রে হৃদ্‌পদ্মে পৌঁছিয়া নিত্যসিদ্ধ হইয়া নিত্যস্থিতি লাভ পূর্বক সাধকের অখণ্ড মহাযোগ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ওঙ্কারকে জানিলে আর নিজেকে কখনও হারাইবে না। ওঙ্কার অমৃত স্বরূপ। ওঙ্কারকে জ্ঞাত হওয়াই বিশ্বকে জানা, নিজেকে জানা, আদ্যাশক্তিকে জানা একই কথা। একমাত্র ইহাকে জানাই প্রকৃত সাধনা—ক্রিয়াযোগ।

(সহায়ক গ্রন্থ ঃ শ্রীপুলিন ব্রহ্মচারীর রচিত ''তারাপীঠ''।)